শৈলজারঞ্জন মজুমদার

রবীন্দ্রসঙ্গীতে চিরসুন্দরের নিত্য আনাগোনা

পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি—মূলত এই ত্রিধারায় রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে আমরা পাই। এই নির্বাচন কবি স্বয়ং করে গেছেন এবং সেইভাবেই গানগুলিকে নানা প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে।

কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গানগুলি এইভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত হলেও একটা যেন মেশামিশি ঘটেছে। বাণী অনুসারে প্রকৃতির কোনো কোনো গান মনে হয় পূজা পর্যায়ে স্থান পেলে ভালো হত। তেমনই পূজার অনেক গান প্রকৃতির ভাবে রসে মুখর। প্রেম অংশের অনেক গানে নিবিড় অধ্যাত্মানুভূতির প্রকাশ। সে প্রেম যেন মানুষী ভাবের মধ্যে তাঁকেই খুঁজছে যাঁকে ধরা যায় না দৃষ্টিতে বা শ্রবণে। সেই স্পর্শাতীত এবং লোকাতীত কোনো সত্তার প্রতি গানগুলি গভীর আকুতি জানায়।

অবশ্য বেশির ভাগ গানই যে বিভাগানুযায়ী সঙ্গত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে যে গানগুলির ভাব ও বাণী এই শ্রেণী বিভাগের রীতি না মেনে পরস্পরের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সেখানে মনে হওয়া সম্ভব যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সেরকম উদাহরণ হয়ত দেখানো যায়।

কিন্তু যে অসঙ্গতি আমাদের চোখে ধরা দেয় এবং যা মনে হয় অন্যভাবে করা গেলে ভালো হত তা হয়ত আমাদের গানের কথাগুলিকে তাদের ভাষাগত বা আক্ষরিক অর্থে বোঝাবার চেষ্টার দরুণ। রবীন্দ্রনাথের সকল গানের পিছনেই যে জেগে রয়েছে একটা অন্য কোনো তত্ত্বের আভাস, যা শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়মনের বা বিচারবুদ্ধির এলাকায় গণ্ডিবদ্ধ নয়, তা একটু গভীরভাবে গানগুলিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের অনুভবে তার বাইরের রূপটিই মাত্র নয়। তার মধ্যে সর্বব্যাপী এক বিশ্বাত্মাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। সেই বিশ্বাত্মা এবং তাঁর মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ রয়েছে। এই যিনি সর্বরূপের মধ্যে থেকেও আড়ালে রয়েছেন তাঁকে কবি দেখছেন চিরসুন্দর রূপে। কিন্তু বাইরে তিনি নেই, আছেন তাঁরই মধ্যে, তাঁর অন্তরে। তাঁর সঞ্চরণ প্রকৃতিতে ফুল ফোটায়, সুগন্ধ বহায়, ঋতুর ডালা ভরে অর্ঘ্য সাজায়। প্রকৃতি তাঁরই বন্দনা।

বসন্তের আগমন তাঁরই উৎসবের আনন্দ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়—তাই কবি গান বাঁধেন—

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে।
জগৎজনহৃদয়রঞ্জন চাহি তব পানে ॥

এই গানটি প্রকৃতির মধ্যে স্থান পেলেও ভাবের দিক দিয়ে এটি একটি ভক্তিগীতি; অধ্যাত্ম আবেদনে ভরা। তবু এটিকে প্রকৃতিরই গান ধরা হয়েছে, তারই মাধুর্যকে প্রকাশ করেছে।

পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি সব গানেতেই আমরা পাই একটা কোনো বিশেষ উপলব্ধির পরিচয়। পরম অব্যক্তের মহিমা জগতের সকল অভিব্যক্তির অন্তরালে বিরাজ করছে। পূজার গানগুলি স্তবগীতি, সেই পরমের প্রতি নিবেদিত। জগতের সকল শোভা, সকল রূপ তাঁরই আভাস বহন করছে। প্রকৃতির মাধুর্যে তাঁরই আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। সেই বিশ্বভাবন পুরুষের সঙ্গে মরমী অন্তরের নিবিড় সাযুজ্য। বিশ্বজীবন তাঁরই অভিসারে চলেছে তাঁকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু সে চলায় আনন্দ এবং দুঃখ দুই-ই আছে। মানুষের হৃদয়ের তারে বেজে উঠছে পাওয়া না পাওয়ার আশা-নিরাশার সুর। যে অধরাকে সে ধরতে চাইছে তা যেন কেবলই তাকে এড়িয়ে যায়। জগতের সব কিছুতেই তিনি আছেন, তাঁর ইচ্ছায় সর্বকিছু স্পন্দিত হচ্ছে, সর্বকিছু স্বরূপ এই যে তিনি, তাঁকে না জানলে কোনোকিছুকেই সত্যরূপে জানা যায় না। এই আধ্যাত্মিক অনুভবটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল আশ্রয়।

কয়েকটি গানের উল্লেখ করলে এই সত্যটি বোঝা যাবে এবং পূজা প্রেম ও প্রকৃতির ভিতরে যে একটি একাত্মতা রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি গান—'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে'— এই গানটি প্রকৃতি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠানের জন্য কবি কয়েকটি গান শেষ জীবনে রচনা করেছিলেন। এ গানটি সেগুলির মধ্যে একটি। গানটি যাঁরা শুনেছেন অথবা গেয়েছেন তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন। এর বাণী এবং সুরে এমন একটি তন্ময়তা প্রকাশ পায় যা আমাদের চিত্তের সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। মানুষের অন্তরের গহনে একটি বিরহী হৃদয় রয়েছে। চিরকালই সে তার বেদনা জানিয়ে চলেছে তার মর্মগভীরের আপনাকেই। প্রকৃতি সেই বর্ষণঘন রাত্রির বিরহকেই যেন স্মৃতিতে উদ্বেল করে তোলে। কিন্তু গানটির বাণী ও সুরের সঙ্গমে এমন এক লোকাতীতের অনুভূতি পাওয়া যায় যা ব্যাখ্যাতীত।

এই গানটি অনায়াসে প্রেমের গানগুলির মধ্যে স্থান পেতে পারত। কারণ যে 'পুঞ্জিত বেদনা' কবির প্রাণে সুরের সঙ্কেতে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তা প্রেমেরই বেদনা, প্রেমেরই এক বিমূর্ত অনুভূতি। কিন্তু কার প্রতি? কার কানে কানে কবি শোনাতে চান তাঁর অন্তরের এই আনন্দ-বিরহের বাণী? তার সত্যটি তো আসলে

ঈশ্বর বিরহেরই, তারই রসনিবিড় আকুতি। সে হিসাবে এ গানটি অন্য অনেক পূজার গানের মতো পূজা খণ্ডেরই অন্তর্গত হতে পারত। কিন্তু গানটি কবি রচনা করেছিলেন বর্ষা বন্দনার গান হিসাবেই।

এর সঙ্গে ওই উপলক্ষে রচিত আর একটি গানের উল্লেখ করা যায়। সেটি হল— 'আমার প্রিয়ার ছায়া।' ভাবের দিক দিয়ে এটিকেও প্রেমের গান বলা চলে। একই বিরহের আকুলতা এর বাণীতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এটি প্রকৃতির ভাব সম্পৃক্ত। বিশ্ব প্রকৃতির দিকে অন্তর পুরুষ যেন চেয়ে আছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, বিধুর হৃদয়ে। আগের গানটিতে যে বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল হৃদয়ের অস্ফুটবাণী এখানে তা কোনো এক পলাতকা স্মৃতিকে খুঁজে পায় প্রকৃতির বর্ষার ছবিতে। এই গানটিকে প্রকৃতির একটি সূক্ষ্ম মর্মর কাব্যগীতিরূপেও দেখা চলে।

বর্ষার এই গানটির সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি কবির পূর্বে রচিত অন্য একটি গানকে—'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি'। বাণীর দিক দিয়ে এটিকেও বর্ষাগীতি মনে করলে কোনো আপত্তি ওঠা উচিত নয়। এর কথাগুলিতে এক অন্তরবাসিনী প্রিয়ার স্মৃতি বর্ষার সজললীলায় যেন জেগে উঠেছে। তবু কোনো ভাবেই এ গানটি সাধারণ অর্থে একটি প্রেমের গানরূপে গণ্য করা যায় কিনা সন্দেহ।

প্রেম খণ্ডের আর একটি গান আমরা আমাদের এই আলোচনায় উল্লেখ করতে পারি। এটি 'বনে যদি ফুটল কুসুম'। এই গানটির ভাষায় ও সুরে বিরহের করুণ ভাব প্রকাশ পায়। কবি এখানে একটি পাখিকে প্রতীকরূপে গানটির মধ্যে রেখেছেন। এই পাখি সেই পাখি যার ডাক প্রকৃতির প্রাণে আনন্দধারা বইয়ে দেয়; যার অভাবে হৃদয় নিরানন্দময় মরুভূমির মতো শুষ্ক হয়ে থাকে। এই পাখিকে মনে করতে পারি আমাদেরই অন্তরের চৈতন্য স্বরূপ, যাঁর পরশে নিখিলভুবন আনন্দিত হয়ে ওঠে, বসন্তের গান জেগে ওঠে। কিন্তু হৃদয়ের সেই পাখিটিকে যদি না পাওয়া যায়, যদি না সে যোগ দেয় বাইরের সকল সমারোহে প্রাণের সকল উৎসব ব্যর্থ হয়। এ গানটিতে এক লোকোত্তরের এষণা আমরা দেখি— 'কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি'। এ গানটিতে পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিক ভাব প্রকট। যাকে সাধারণত প্রেমের গান বলে ধরা হয় এ গানটি যেন তা থেকে অনেকদূরে সরে গেছে। তবু গানটিকে প্রেমের খণ্ডেই কবি স্থান দিয়েছেন, যদিও আমাদের মনে হতে পারে এ গানটি পূজা খণ্ডে স্থান পেলেই যেন সঙ্গত হত।

পূজার কোনো কোনো গানে প্রকৃতির এমন রূপময়ী মাধুর্যের ছবি কবি এঁকেছেন যাকে আধ্যাত্মিক গানের পঙক্তিতে দাঁড় করানো আমাদের কাছে একটা ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। একটি গানের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'। কোন এক দিনান্তের রঙ লাগা আকাশের দিকে চেয়ে দেখছেন

কবি। গানটি সেই বিশেষ ক্ষণের একটি নিখুঁত বর্ণনা, যা অনুভূতির পর্দায় সৌন্দর্যের মূর্ছনা জাগিয়ে তোলে। এই গানটিকে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির একটি অনুপম বন্দনা বললে অসঙ্গত হবে না। ইন্দ্রিয় মনের রসাবেশে তা বিভোর। কিন্তু কবির চেতনার এই রসাবেশের আড়ালে রয়েছেন বিশ্ববিমোহন সেই পরমসুন্দর। বৈদিক ঋষিরাও এইভাবেই প্রকৃতিকে দেখেছিলেন। মধু বায়ু বইছে, নদী মধু-ধারাকে ক্ষরিত করছে। তবু মনে হয় গানটির সৌন্দর্য আমাদের চিত্তবুদ্ধির কাছেই বিশেষ আবেদন জানায়। প্রকৃতির মাধুর্য আমরা দৃষ্টিতে শ্রবণে ঘ্রাণে স্পর্শে অনুভব করতে পারি। আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু চিত্তের প্রসার ঘটে। মনেতে একটি রঙিন সন্ধ্যার দৃশ্যপট ফুটে ওঠে। গানটিকে প্রকৃতির গান বলা সঙ্গত। তবু তার মধ্যে আমরা শুনি যেন অসীমের সুর, অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে যা টেনে নিয়ে যায় কোন্ সুদূরের পারে, সকল দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে।

এইবার আমরা এমন একটি গান নিয়ে আলোচনা করছি যেটি প্রকৃতির গান হিসেবে ধরা হয়। গানটি 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'। এ গানটিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। পুরোপুরি এটিকে বলা যায় আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। এক অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রিতে তাঁর পরাণসখা অভিসারে চলেছেন। অভিসারের শেষে মিলন, কিন্তু দুর্যোগময়ী রাত্রি পেরিয়ে যেতে হবে। মরমিয়া সাধকের প্রাণে বাইরের অন্ধকার তাঁর ঈশ্বর বিরহের বেদনাকেই তীব্র করে তোলে। ঈশ্বর এবং জীবের হৃদয়ে এক নিত্যলীলা চলেছে। সাধক সর্বত্রই তাঁকে দেখেন; সকল রূপ সেই কৃষ্ণের রূপকেই মনে করিয়ে দেয় বৈষ্ণব কবি যেমন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই এই মরমী উপলব্ধির পরিচয় মেলে। গানটিতে প্রকৃতির দুর্যোগরাত্রির বর্ণনার সঙ্গে ওতপ্রোত হৃদয়ের একটি ছবি। মরমী ঈশ্বরকে দেখেন তাঁর সখারূপে কখনও দয়িত রূপে। বাইরে ঝড়, অন্ধকার, মন শঙ্কায় ভরে উঠেছে! কোনো গৃহবধূর মন যেমন শঙ্কায়িত হয়ে ওঠে স্বামীর কথা ভেবে, এই মানুষী প্রাণের ভাবটিকেই কবি ভরিয়ে তুলেছেন তাঁর ঈশ্বর বিরহের বেদনায়। সেই যিনি তাঁর একান্ত অন্তরতম প্রিয়, বহুদূরে যেন তিনি অন্ধকারের ভিতর তাঁর পথ হয়ত কোনো গহন বন, উত্তাল নদী পার হয়ে তিনি চলেছেন। এই আত্মরত অনুভূতির ভিতর অধ্যাত্মভাবকে আমরা অতি সহজে পাই। এই সহজে পাওয়া, সহজে ছোঁওয়া অনির্বচনীয়কে—মরমিয়া সাধনার এইটিই বিশেষ সত্য।

এ গানটিতে প্রকৃতি ও পূজার মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে, যদিও আধ্যাত্মিক ভাবটিই এর মধ্যে প্রধান। যে ঈশ্বর প্রেম, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে সর্বব্যাপী, সেটি এই গানে সুস্পষ্ট। এই একই ভাবনা আরও একটি বর্ষাগীতিতে আমরা দেখি—

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই গানটিতে। সেই একই বিরহের সুরে, প্রকৃতির ঘনঘটা তাকে যেন আরও বিধুর করে তুলছে। 'তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা।' এই উক্তি কেবলমাত্র এক বিরহবিষণ্ণ নারীহৃদয়ের অন্তরঙ্গ বেদনাকেই জাগিয়ে তোলে। আমরা স্মরণ করতে পারি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে রাধার বিরহ ব্যথার পদটি—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'। এ দুটি গানই যে আধ্যাত্মিক পর্যায়ের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের এই আলোচনায় যে বিশেষ কথাটি বলতে চেয়েছি তা হল, রবীন্দ্রসঙ্গীতের আঙ্গিক যাই হোক এবং যে ভাবেই তার বিভাগ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতির গানের পশ্চাৎপটে রয়েছে এক অখণ্ড অনুভূতি। এক অদ্বৈতকেই কবি তাঁর সমস্ত গানের প্রেরণা, গানের উৎসরূপে দেখেছেন। সেই অদ্বৈতকে তিনি দেখেছেন পরমসুন্দর রূপে। পরম, তাই তিনি অরূপ, কারণ কোনো রূপই তাঁর অসীমতাকে অনির্বচনীয় রূপকে ব্যক্ত করতে পারে না। সেই পরমসুন্দরই তাঁর হৃদয়ের গোপনে বাস করেন। তিনি অন্তর্যামী, বিশ্বভুবন তাঁরই প্রকাশ। তাঁকেই তিনি খুঁজেছেন তাঁর গানের অর্ঘ্য সাজিয়ে কখনো প্রকৃতিতে, কখনো আপন হৃদয়ে, কখনো বা বিশ্বাতীত পরম সত্তায়। প্রকৃতির রূপে, রসে তাঁরই রূপ তিনি ধ্যান করেছেন। ভক্তি প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভব-চেতনার একটি উৎসমূল হতেই নেমে বিভিন্ন ধারায় বয়ে গিয়েছে। সেই হিসাবে দেখলে সঙ্গীতের বিভাজনে যে একটি মেশামিশির ভাব কখনো আমরা দেখি তাকে হয়ত অসঙ্গত বলা চলে না। □